দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 MAR 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

১৩২

২ দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৯৫

স্কুল নাই অথচ !

কথায় বলে, কাজীর গরু কেতাবে আছে কিন্তু গোয়ালে নাই। এই প্রচলিত প্রবাদটির বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে আমাদের বগুড়াস্থ সংবাদদাতা প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন যমুনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রতিমাসে সেখানকার শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পাইতেছেন। যমুনা নদীর পূর্বতীরস্থ চালুয়াবাড়ী, নাকুল্লা, হাটশেরপুর, কাজলা, কনিবাড়ী, চন্দনবাইশা ও বোহাইল ইউনিয়নের ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গত ৫/৬ বছর পূর্বে নদীর ভাঙ্গনের ফলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐসব স্কুলে কোন ছাত্র-ছাত্রী না থাকিলেও শিক্ষকরা আছেন এবং তাঁহারা নিয়মিত বেতনও পাইতেছেন।

নদী ভাঙ্গনের ফলে গ্রাম যখন নিশ্চিহ্ন হয় তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও যে নিশ্চিহ্ন হইবে ইহাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। এবং যেহেতু স্কুল শিক্ষকদের দোষে নদী ভাঙ্গে নাই, সেইহেতু তাঁহাদের চাকুরী থাকিবে এবং চাকুরী থাকিলে বেতনও পাইবেন ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বরং বেতন না পাইলেই উহা অনিয়ম হইত এবং উহা সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হইত। কিন্তু এখানে ইহা সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার প্রধান কারণ হইল সময়। চৌদ্দটি স্কুল নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেল পাঁচ-ছয় বছর আগে, কিন্তু অন্যত্র সেগুলি পুনর্নির্মাণের কোন উদ্যোগ-আয়োজন নাই, এ কেমন নিস্পৃহতা। ঐ সব স্কুলের শিক্ষকরা যে বেতন পাইতেছেন সেগুলি তো আর সরাসরি তাঁহাদের হাতে যাইয়া পৌঁছাইতেছে না, প্রশাসনের মাধ্যমে তাঁহাদের বেতন হইতেছে। তবে কি জেলা কিংবা উপজেলা প্রশাসনই অবহিত নন যে, অত্র এলাকায় ১৪টি স্কুল নদীগর্ভে নিমজ্জিত? যদি না জানা থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা দুঃখজনক ব্যর্থতা। আর যদি নিমজ্জিত হওয়ার সংবাদ প্রশাসনের জানা থাকে তাহা হইলে পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ এই অবস্থা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাহাদের কি বক্তব্য?

কিন্তু শুধু বগুড়ার এই একটি অঞ্চলই নয়, বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই ঔদাসীন্যের চিত্র ধরা পড়িবে। এদেশে হিসাব অনুযায়ী যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে উহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটি চালু আছে এ সম্পর্কে যদি একটি পরিসংখ্যান লওয়া যায় তাহা হইলে কি বগুড়াস্থ সংবাদদাতার প্রতিবেদনের মতই ফলাফল আসিবে? এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে ঐ সমস্ত স্কুলে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে সব পুস্তক বরাদ্দ হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোথায় যায়? কে কিভাবে সেগুলি সংগ্রহ এবং বিতরণ করে সে সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। অনুসন্ধান প্রয়োজন অস্তিত্বহীন প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যার।

আমরা মনে করি যাঁহারা বিনা স্কুলেই বেতন পাইতেছেন তাঁহাদের অপেক্ষা দায়দায়িত্ব বেশী বর্তাইবে তাঁহাদেরই উপর—যাঁহারা এইসব স্কুলের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইয়া কিংবা না হইয়াই ব্যয় বরাদ্দ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা ঐসব অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা লইয়াই কোন চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন না। অথচ গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা মোচন, সবার জন্য শিক্ষা, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপক শিক্ষাদান কর্মসূচী চালু ইত্যাদি বহুবিধ শ্লোগানে এই সমস্ত দফতর মুখরিত। এইসব শ্লোগান যে কত অসার এবং তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িতেছে উহা বোধহয় প্রকাশিত প্রতিবেদনের পর আর নূতন করিয়া প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। সেই জন্যই বছরের পর বছর ধরিয়া স্কুল উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়—অথচ গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ স্কুলের নড়বড়ে অবস্থা ঘোচে না। দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায় না এবং এই ধরনের উদাসীনতা ও অবহেলার কারণেই প্রাইমারী শিক্ষকদের চাকুরী যতটা আকর্ষণীয় হইয়াছে, গ্রামদেশে মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়াছে ততোধিক। 'সবার জন্য শিক্ষা' এই শ্লোগানকে অর্থবহ করিতে হইলে এই অবস্থার আশু অবসান একান্ত কাম্য।